।। পরিচালক বনাম সিনেমাটোগ্রাফার ।।

'আমি বুঝি যে একটা ছবি প্রকৃত বাস্তবে গড়ে ওঠে যখন ক্যামেরা পৃথিবীর মুখোমুখি, বাস্তবের মুখোমুখি । আর যখন ক্যামেরা আর বাস্তবের মধ্যে সংঘর্ষটা প্রকৃতই শু(হয়, তখনই একটা ছবির জন্ম হয় ।'—বার্তেলুচি ।

'পরিচালক 'এ'-র সঙ্গে আলোকচিত্রী 'এ'-র এক রকম সম্পর্ক এবং পরিচালক 'বি'-র সঙ্গে আলোকচিত্রী 'এ'-র আর এক সম্পর্ক । —সুব্রত মিত্র ।

পরিচালক—চলচ্চিত্রের সব বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত, পরিচালনায় বিশেষজ্ঞ ।

সিনেমাটোগ্রাফার—চলচ্চিত্রের সব বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত, আলোকচিত্রায়ণে বিশেষজ্ঞ ।

পরিচালক ফ্লোরে আসেন চিত্রনাট্য এবং বিমূর্ত ভাবনা নিয়ে । সিনেমাটোগ্রাফার ফ্লোরে আসেন পরিচালকের বিমূর্ত ভাবনা মূর্ত করার জন্য । পরিচালক ভাবনা সৃষ্টি করেন । সিনেমাটোগ্রাফার সেই ভাবনার রূপদান করেন । কখনও কখনও তাকে অতিত্র(ম করেও কিছু ! চলচ্চিত্র সিনেমাটোগ্রাফি সৃষ্টি করেনি, সিনেমাটোগ্রাফি চলচ্চিত্র সৃষ্টি করেছে ।

চলচ্চিত্র যৌথ শিল্প, কিন্তু পরিচালকের মাধ্যম । সিনেমাটোগ্রাফারের দ(তা সৃজনশীলতা নির্ভর করে পরিচালকের মনোভাবের, দৃষ্টিভঙ্গির সার্থক রূপায়ণে ।

পরিচালকের ভাবনা মৌলিক । সিনেমাটোগ্রাফারের সৃজনশীলতা, তাকে অবলম্বন করে আরও কিছু । কিন্তু এমন একটা ধারণা স্টুডিও মহলে প্রচলিত আছে যে, সিনেমাটোগ্রাফারের দ(তা নির্ভর করে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে সুন্দর করে সমস্ত ইমেজগুলিকে ঝকঝকে তকতকে করে পর্দার বুকে ফুটিয়ে তোলার উপর । আসলে যা বাস্তব, যা আছে, তার চিত্রায়ণ ছাড়াও ছবিতে, পর্দায় সিনেমাটোগ্রাফার একটা নিজস্ব কল্পনা, শিল্পসত্তা সৃষ্টি করেন । এই শিল্পসত্তা এমনই মৌলিক যে, দুজন সিনেমাটোগ্রাফার যদি একই ছবি চিত্রায়ণ করেন, দুটো ছবির ইমেজ, প্রতিত্রি(য়া আকাশ-পাতাল তফাৎ হতে বাধ্য।

চলচ্চিত্র চিত্রনাট্যের নির্দেশ, পরিচালকের বিমূর্ত ভাবনা, রূপসজ্জাকারের রূপায়ণ, শিল্পনির্দেশকের নির্মাণ, সম্পাদকের পরিমিতিবোধ এবং সিনেমাটোগ্রাফারের টেকনিক্যাল কল্পনার চূড়ান্ত প্রকাশ ।

সিনেমাটোগ্রাফারের আয়ত্তে আছে এমনই টেকনিক্যাল দ(তা এবং শিল্পমনস্কতা, যার দ্বারা তিনি চিত্রনাট্যকার, শিল্পনির্দেশক, রূপসজ্জাকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচালকের কল্পনার বাস্তব রূপ দিতে পারেন । বিমূর্ত কল্পনার বাস্তবায়নের টেকনিক্যাল উপায় এবং শিল্পায়ণের সম্ভাবনা অসীম দিগন্ত—সিনেমাটোগ্রাফি।

পরিচালক এবং সিনেমাটোগ্রাফার সেই বিমূর্ত সম্পর্কে আবদ্ধ, যা থেকে উদ্ভূত বি(্বাস এবং নির্ভরতার দাবিতে পরিচালক আস্থাবান হন যে, সিনেমাটোগ্রাফার তাঁর কল্পনার বাস্তব রূপ দিতে তো পারবেনই, সেই সঙ্গে সমৃদ্ধ করবেন তাঁর সৃজনপ্রয়াস। অতএব, সিনেমাটোগ্রাফারের থাকে এমন স্বাধীনতা—যার দ্বারা তিনি প্রতি মুহূর্তে পরিচালককে অনুপ্রাণিত করেন । এবং তাঁর টেকনিক্যাল নির্দেশ, আলোকবিন্যাস পরিকল্পনা পরিচালক অনুসরণ করেন । যদি না পরিচালক এবং সিনেমাটোগ্রাফার পরস্পরের কাছে অসৎ এবং অস্পষ্ট থাকতে চান কিংবা পরস্পরের বি(দ্ধাচরণ করেন ।

বার্গম্যান-এর মতে—'ক্যামেরাম্যানের প(দু'টো জিনিস খুব প্রয়োজন । প্রথম হচ্ছে টেকনিক্যালি তাঁকে হতে হবে

একেবারে নিখুঁত, এবং একইসঙ্গে আলোর ব্যাপারে তাঁকে প্রথম শ্রেণীর হতে হবে । দ্বিতীয়, নিজের ক্যামেরা চালনাতেও তাঁর প্রথম শ্রেণীর যোগ্যতা থাকা চাই । ক্যামেরাম্যান আর আমি, দুজনের মধ্যে একটা চুক্তি(হয়, সেটা হচ্ছে ইমেজে কী যোগ করতে হবে । আলো এবং পরিবেশের সমগ্র পরিকল্পনাটাই আমরা আগে থেকে ছকে রাখি । তারপর যাতে আমরা দুজনে রাজি হয়েছি, সে অনুযায়ী ক্যামেরাম্যান, তাঁর কাজে এগিয়ে যান । ছবির ব্যঞ্জনা নির্ভর করে ছন্দ এবং মুখমন্ডলের মিলনে, Tensions and relaxation of tensions. ইমেজের আলোটাই সব ঠিক করে । ধীরে ধীরে আমার আর গুণার ফিশারের ভাবনা চিন্তার যোগটা ছিঁড়ে গেল । আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরী হয়ে গেল । মানে আমাদের দুজনের একত্ব, আমাদের দুজনের ব্যক্তি(গত সম্পর্ক, ব্যক্তি(গত আন্তরিক আদান প্রদান, যা আমাদের কাছে ছিল অত্যন্ত জ(রী, সেটা আলগা হয়ে গেল, পুরানো বাঁধনটা খসে গেল, এর কারণ কি জান, দিন দিন ওর ওপর আমি বড্ড বেশী কর্তৃত্ব করছিলাম, প্রায় একটা পীড়নকারী হয়ে উঠেছিলাম, নিষ্ঠুর ও খামখেয়ালী হয়ে উঠেছিলাম, এবং এ ব্যাপারটায়ও সচেতন হয়ে উঠেছিলাম যে আমি ওকে অপমান করতে পারছি, ...—(এইরকম ঘটনা কি ঘটেছিল সত্যজিৎ রায় এবং সুব্রত মিত্রের মধ্যে ? সুব্রত মিত্র কেন সত্যজিৎ রায়ের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন, সে বিষয়ে আমাদের জানিয়েছেন । কিন্তু সত্যজিৎ রায় এই বিষয়ে অদ্ভুত নীরব !)

'নিকভিস্ট অনেক বেশী দৃঢ় ব্যক্তি(ত্বের মানুষ । ওর বি(দ্ধে যাবার কোন সুযোগ ও দেয়নি । ইমেজের প্রয়োজনে যে আলো, তার আবেগ অনুভূতি আমার তরফে, আর বাকি কাজটা সব দা(ণ রকম যত্নশীল সহজ স্বচ্ছন্দ, যান্ত্রিক দিক থেকে রীতিমতো দ(বুদ্ধিমান তী(্ধী নিকভিস্ট । অথচ গুণার ফিসার কিন্তু একজন অসাধারণ শিল্পী, নিঃশব্দ, অন্তর্মুখী একজন মিউজিশিয়ানের মতো । আমি যত আত্র(মণাত্মক হয়ে উঠেছি, তিনি তত নিজেকে ভেতরে গুটিয়ে নিচ্ছেন । অদ্ভুত মানুষ।

'Devil's Eye' (১৯৬০)-তে ব্যাপারটা আমাদের প্রায় ভাঙনের মুখে নিয়ে এল । কাজ যদি কিছু হয়ে থেকে সেটা হয়েছে, যেহেতু তিনি একজন শিল্পী । কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার কাজের ব্যাপারে আমি কখনো প্রস্তুত থাকতে পারিনি। নিকভিস্ট-এর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে অবশ্য এ অসুবিধাটা হয়নি ।

'নিকভিস্ট আমার ক্যামেরাম্যান । 'Winter Light' (১৯৬৩)-এর সময় আমরা দুজনে একসঙ্গে আলো পরী(া করেছিলাম । ভোরবেলা থেকে সন্ধে হয়ে যাবার পরেও আমরা গির্জার ভিতরে থাকতাম, আলোর সবরকম তারতম্য ধরে রাখার জন্য । আমাদের দুজনেরই একই ইচ্ছা, একই আগ্রহ, এমনকি মঞ্চেও এটা আমি অনুভব করি, এই আলোটা সৃষ্টি করা । আলো এবং মানুষের মুখ ছায়ার দ্বারা পরিবৃত । এটাই আমাকে খুব অবাক করে ।'

পরিচালক এবং সিনেমাটোগ্রাফার—শিল্পসৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত দুজন সৃজনশীল মানুষ । যৌথ সৃষ্টির দ্বান্দ্বিক আর্তিতে আত্মমগ্ন শিল্পী । পরিচালনা বনাম সিনেমাটোগ্রাফি ।

'I recall a long argument I once had with Satyajit Ray, when I told him that I could find no logic or significance in Ozu's insistence on placing the camera at a certain height from the ground to simulate the subjective viewpoint of any Japanese sitting on the floor, never moving the camera, and in the process sacrificing the possibility of different camera angles and viewpoints, as also the moving camera. I said that I would not mind putting the camera upside down if that is what the shot demanded. Ray retorted that he could imagine drawing a great satisfaction from this kind of self-discipline, which he compared to that of using only certain notes in a particular raga in Indian classical music, and not being allowed to use the other notes at all. I have never been convinced by this logic. Ray did not bind himself to any such limitations. So what he was upholding would definitely be only one way of looking at things.'

'On shooting the Apu Trilogy'
Subrata Mitra

।। পরিচালক বনাম লাইটস্কীম, এবং... ।।

চলচ্চিত্র পরিচালকের মাধ্যম, আবার একই সঙ্গে দলগত শৈল্পিক প্রয়াসও বটে । পরিচালক যদি চলচ্চিত্রের যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে শি(ত না হন, তবে তাঁর সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর কোন শিল্পী, টেকনিশিয়ান চূড়ান্ত দ(তার সৃষ্টিশীল কাজ করতে পারেন না । পরিচালক যদি সিনেমাটোগ্রাফারের উপর আস্থাবান না হয়ে অস্পষ্ট থাকেন—সিনেমাটোগ্রাফারকে আজ্ঞাবহ মনে করেন, তবে সিনেমাটোগ্রাফারের চূড়ান্ত দ(তা, সৃষ্টিশীলতা তিনি অর্জন করতে পারবেন না । লাইটস্কীমের সার্থক প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন পরিচালকের উদার দূরদৃষ্টি এবং সিনেমাটোগ্রাফি সম্বন্ধে বিশেষ শৈল্পিক ও টেকনিক্যাল ধারণা এবং আস্থা । পরিচালকের প্রকাশভঙ্গি, কম্পোজিশন পরিকল্পনা এবং সিনেমাটোগ্রাফারের আলোকায়নের যেখানে সার্থক সমন্বয় হয়, সেই ছবিতেই একমাত্র লাইটস্কীমের যথার্থ প্রয়োগ হতে পারে । হয় ।

আলোর দ্বারা সংঘটিত কোন কাজে আলোকে ভাষায়, প্রতীকে রূপান্তরিত করে শৈল্পিক ব্যঞ্জনামন্ডিত করার পরিকল্পনাকে আমি বলবো লাইটস্কীম । চিত্রগ্রহণের জন্যই আলোর প্রয়োজন । অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যেমন চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে ভাষা, চালচলন, রূপসজ্জা, পোশাক ইত্যাদি দিয়ে, তেমনি আলোও প্রকাশ করে চরিত্রের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা এবং চলচ্চিত্রের অন্তর্লীন স্রোত ।

অতি আলো, আলো, আলো-ছায়া, অন্ধকার—এই বিন্যাসের মধ্যেই আমরা কোন বস্তু দেখি । চলচ্চিত্র যখন নির্বাক ছিল তখন নীরবতার কোন ব্যঞ্জনা ছিল না । তখন শব্দ হয়ে উঠেছিল ব্যঞ্জনাময় । আবার সবাক চলচ্চিত্রে নীরবতার ভাষা সুদূর প্রসারী এবং তাৎপর্যময় । আধুনিক চলচ্চিত্র শব্দময়, নীরবতায় কথা বলে, বাঙ্ময় ।

আলো-আঁধার, আলো-ছায়া—এই আলোর স্তরবিন্যাস, বর্ণত্র(মের মধ্যেই আলো প্রতীক, ভাষাময়, নীরব ।

শম্ভু মিত্র 'কাকে বলে নাট্যকলা' বক্তৃ(তায় নাটকের ভাষা ব্যাখ্যা করে বলেছেন—'যেমন ধরা যাক যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। নরা যেন স্বামীর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে । স্বামী অনেক বড়, এমন গোছের একটা ভাব । সামনে বসে না । বসলেও সম-আসনে বসে না । সে নিচের আসনে বসে । এই রকম করে চলে নাটকটা । একদম শেষকালে গিয়ে নরা যেখানে বসেছে, মনে হয় সে স্বামীর চেয়েও ওপরে বসে আছে । স্বামী তার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে, আর নয়তো নিচের আসনে বসে । সম্পর্কটা পালটিয়ে গেছে । ওই রকম অভিনেতাদের সাজানোর মধ্যে অনেক মানে তৈরি হয় ।

'রক্ত(করবী'র মধ্যে প্রথম আছে নন্দিনীর কাছে একটা কিশোর বয়স্ক ছেলে এসে কথা বলছে । এবারে আপনারা কল্পনা ক(ন, একটা কিশোর বয়স্ক ছেলে সবে যার গলাটা বদলিয়েছে সেই ছেলে এসে ওর সঙ্গে কথা বলছে । স্পর্ধা করে বলছে, —'আমি মানব না । মানব না । ওদের মারের মুখের উপর দিয়ে তোমায় ফুল এনে দেব ।'—বলে যেমনি দৌড়ে চলে গেল নন্দিনী বারণ করল, শুনল না । সঙ্গে সঙ্গে ওপর দিক থেকে একটা বৃদ্ধ গলা—অধ্যাপকের—'নন্দিনী যেও না শোনো শোনো।' ভাবুন এই কিশোরের গলাটা আর তার পরে ঠিক সেটা শেষ হলেই—তখনই একটা বৃদ্ধের গলা । সেই বৃদ্ধ-গলাটা কথা বলে যখন চলে গেল, তখন সন্দিগ্ধমনা ওই যে গোকুল, তার খ্যানখেনে গলা-সন্দিগ্ধ সে এসে বলে—'তোমাকে তো বুঝতেই পারলুম না, তুমি কে ?' তার গলার স্কেল অন্য, এবং সে যখন চলে গেল সকলকে সাবধান করতে করতে, তখন রাজার গলা খুব জোরালো হয়ে শোনা গেল—'কে ? নন্দা ?'

এই যে একটা ভূমিকা—প্রথম সূত্রপাত নাটকটার এই যে চারটি চরিত্র আসে—মাঝখানে মূল বাজনাটা হচ্ছে নন্দিনীর কণ্ঠ, এবারে আলাদা আলাদা যন্ত্রের মতো আলাদা আলাদা কণ্ঠ আসছে, এবং এগুলো সমস্ত মিলিয়ে একটা Orchestration তৈরী হচ্ছে । এরকম অনেক জিনিস তৈরী হয় । দর্শকদের অনেক সময় দেখেছি—সচেতন জ্ঞানের মধ্যে আসে না।

সচেতন ভাবে আসে না কিন্তু অচেতন ভাবে তাদের ভেতরে গিয়ে এগুলো প্রবেশ করে । এর কাজ একটা হয়, ফল একটা হয় । আর মহৎ শিল্পকলা মাত্রেই তো এইরকম চেতন-অবচেতন নিয়ে নানা স্তরে কাজ করে । কত নাড়া দেয় । সব সঙ্গোপনে । তারই নাম তো শিল্পকলা ।'

চলচ্চিত্র আদিতে নাট্যকলা । আধুনিক চলচ্চিত্র স্বতন্ত্র ভাষা, শিল্পকলা । আর শিল্পকলামাত্রই বিশেষ সম্পর্কে, অন্তর্লীন স্রোতে, চেতনে-অবচেতনে, সঙ্গোপনে ঐক্য সূত্রে সুর-তাল-লয়ে ছন্দোবদ্ধ ।

'অন্বেষণ'— জীবন চৌধুরী আর প্রলয় রায়, দুই বন্ধু রাজনৈতিক কর্মী । জীবন সংগঠক, প্রলয় তাত্ত্বিক । জীবনের অন্বিষ্ঠ (মতা, প্রলয়ের অন্বিষ্ঠ মানবমুক্তি(। এক নারী, অনসূয়া—যাকে প্রলয় ভালোবাসে কিন্তু বলতে পারে না । সে জীবনকে বিয়ে করে ভুল বুঝে প্রলয়ের কাছে আসে । ওদের ভালোবাসায় জন্ম নেয় পাপিয়া । কিন্তু পরিচিত হয় জীবনের মেয়ে হিসাবে । পাপিয়া জেদী, একগুঁয়ে । ত্র(মে ড্রাগের প্রতি আসক্ত(হয় । পাপিয়াকে উদ্ধার করে সৌরভ । সৌরভ শি(কনেতা অশোক মজুমদারের ছাত্র । অশোক মজুমদার নির্বাচনে জীবন চৌধুরীর প্রতিদ্বন্দ্বী ।

এই যে চিত্রনাট্যের বিন্যাস, এর মধ্যে সঙ্গোপনে লুকিয়ে আছে কি কোন আলোর বৃন্দবাদন !

জীবন চৌধুরীর কনট্রাস্ট রেশিও বেশী । পাপিয়ারও তাই । প্রলয় রায় আর সৌরভ গুপ্ত থাকে ছায়াতে কিন্তু ওদের পেছনে উজ্জ্বল পশ্চাৎপট । অশোক মজুমদারের অবস্থান পূর্ণ আলোতে । অনসূয়া জীবনের কাছে আলো-ছায়াতে, প্রলয়ের কাছে পূর্ণ আলোতে । এক সময় ড্রাগমুক্ত(পাপিয়াও আসে পূর্ণ আলোতে সৌরভের পাশে । এই যে আলোর কনট্রাস্ট, টোনাল স্কেল, বৃন্দবাদন চলচ্চিত্রের আঙ্গিকে সুর, তাল, লয়ে ছন্দোবদ্ধ হয়ে অভিনব ভাষা, এটা সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা । চলচ্চিত্র আলো ছাড়াও ক্যামেরা-অবস্থানে, দৃষ্টিকোণে, ফোকাস-আউট অফ ফোকাসে, দ্রুত ও মন্থর গতিতে, ফ্রেমে, স্পেস বিভাজনে, এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণে নিজের ভাষায় ভাব প্রকাশ করে । চলচ্চিত্রের আঙ্গিকে আলো, লাইটস্কীম ভাষায়, প্রতীকে রূপান্তরিত হয়ে চলচ্চিত্রের অন্তর্লীন স্রোতকে ব্যঞ্জনাময় করে । এখানেই সিনেমাটোগ্রাফারের গু(ত্ব । তিনি পরিচালকের শৈল্পিক প্রয়াসকে পূর্ণতা দেন, কখনো বা সমৃদ্ধ করেন, এগিয়েও দেন । তাই পরিচালককে হতে হয় সিনেমাটোগ্রাফারের সৃজন প্রয়াসে উদার আগ্রহী, যৌথ-শিল্পকর্মের সার্থক সঙ্গী, পথ প্রদর্শক ।

চিত্রনাট্যের বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই সিনেমাটোগ্রাফার লাইটস্কীমের পরিকল্পনা করেন । লাইটস্কীম করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কল্পনায় ভেসে ওঠে সেট । এখানে তাঁর সৃজন প্রয়াসকে সহযোগিতা করে চলচ্চিত্র শিল্পের আর এক যৌথশিল্পী—শিল্প-নির্দেশক । পরিচালকের কল্পনা, সিনেমাটোগ্রাফারের আলোক বিন্যাসের, ক্যামেরা চালনার পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য শিল্প-নির্দেশক তাঁর সৃজনী প্রয়াসকে উপস্থাপন করেন যৌথ আলোচনার টেবিলে । এই ভাবে সৃষ্টি হয় আদর্শ সেট । সেট নির্মাণে সিনেমাটোগ্রাফারের গু(ত্ব এইখানেই যে, তার পরিকল্পনাকে অনুসরণ করেই শিল্প নির্দেশক চেষ্টা করবেন সেটের রং এবং আলোর উৎসগুলো বাস্তব সম্মত ভাবে সৃষ্টি করতে । যার ফলে সিনেমাটোগ্রাফারের লাইটস্কীম বি(াসযোগ্য এবং শৈল্পিকভাবে রূপায়িত হবে, এবং সার্থক হবে পরিচালকের শৈল্পিক প্রয়াস । এই প্রসঙ্গে সিনেমাটোগ্রাফারের আরও দু'জন সহযোগী রূপসজ্জাকার এবং পোশাক পরিকল্পনাকারী । মেক-আপ-এর সেড এবং পোশাক-এর রঙের সঙ্গে আলোর সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক । রূপসজ্জাকার এবং পোশাক-পরিকল্পনাকারী । সার্থক সিনেমাটোগ্রাফির জন্য আরও প্রয়োজন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পেশাদারী দ(তা । কারণ, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, দৌড়ানোর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ক্যামেরা প্যানিং, টিল্টি— ক্যামেরা অপারেটিং ।

ফ্লোরে এসে পরিচালক এমন ভাবে কম্পোজিশন করবেন না, যাতে চরিত্রগুলো সিনেমাটোগ্রাফারের পরিকল্পিত আলোক বিন্যাসের শর্ত পালন করবে না । পরিচালক এর বি(দ্ধাচরণ করবেন না—এই শৈল্পিক শর্তে তিনি সিনেমাটোগ্রাফারের সঙ্গে চলচ্চিত্রের যৌথশিল্প কর্মে পারস্পরিক সম্পর্কের চুক্তি(তে আবদ্ধ । যেহেতু, চলচ্চিত্র দলগত শৈল্পিক প্রয়াস ।

পরিচালক এবং সিনেমাটোগ্রাফারের যে পারস্পরিক বোঝাপড়াতে চিত্রনাট্যের চিত্রায়ণ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সম্পর্কেই চলচ্চিত্রের সব বিভাগ পরিচালকের সঙ্গে চলচ্চিত্রায়ণে দায়বদ্ধ । কারণ, চলচ্চিত্রের মত দলগত শৈল্পিক প্রয়াসে চূড়ান্ত সার্থকতার উদ্দেশ্যে কেউ পরিচালকের বি(দ্ধাচারণ করবেন না এই মানসিকতাটাই যথার্থ ধর্মাচরণ ।

স্বাভাবিক আলোকায়ণের ভিত্তি হলো আলোর উৎসের প্রামাণ্যতা এবং অন্ধকার ব্যবহারের বাস্তবতা । যেমন সবাক্ ছবিতে নীরবতা । স্বাভাবিক আলোকায়ন পদ্ধতিতে 'লাইসেন্স', 'কাল্পনিক আলো' ব্যবহারের গু(ত্ব সর্বাধিক । 'লাইসেন্স' ব্যবহারের দ(তা এবং কল্পনার উপরেই নির্ভর করছে সিনেমাটোগ্রাফারের শৈল্পিক (মতা । যদিও ইতিহাস এবং

সিনেমাটোগ্রাফি তথ্যনিষ্ঠ যুক্তি(এবং কল্পনা-নির্ভর সৃষ্টির বৈপরীত্যে স্বভাব-স্বতন্ত্র । তথাপি এই প্রসঙ্গে ইতিহাসের উৎস সম্বন্ধে ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের মন্তব্য আমাকে সমৃদ্ধ করেছে ।— ঐতিহাসিকের (সিনেমাটোগ্রাফারের) কাজ হলো কিছুটা সাহিত্যিকের মতো । ঐতিহাসিক (সিনেমাটোগ্রাফার) যখন কোনও তথ্যের আকর সংগ্রহ (সেটের আলোকায়ন) করবেন—সেই সংগ্রহ করার পদ্ধতিটি অবশ্যই হবে বিজ্ঞানসম্মত, কিন্তু সেগুলির (সেই আলোকায়নের) উপর ভিত্তি করে যখন তিনি ইতিহাস গঠন (চিত্রগ্রহণ) করবেন, সেটা তাঁর নিজস্ব কৃতিত্ব ।

ইতিহাসের সন্ধানে (আলোকায়নের) তথ্যে (সোর্সের) আকর যতটুকু সাহায্য করে তার চেয়ে একটাও বাড়তি কথা (বাড়তি আলো) বলবে (দেবে) না । সোর্স যা বলে, সেটাই গবেষক (সিনেমাটোগ্রাফার) অনুসরণ করবে ।'

সকালবেলা জীবন চৌধুরীর বৈঠকখানায় জানালা দিয়ে আলো আসছে । জীবনবাবুকে কেন্দ্র করে চেয়ারগুলিকে এমন ভাবে সাজানো হলো—চিত্রনাট্যের বিন্যাসে, পরিচালকের দৃষ্টিকোণে চরিত্র-গু(ত্বে, পারস্পরিক সম্পর্কে স্থির হলো তাদের অবস্থান । সিনেমাটোগ্রাফার এই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে সৃষ্টি করলেন, 'কোডাক গ্রে স্কেল' আলোর উৎস থেকে চরিত্রের অবস্থান নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট বিভিন্ন স্তরের আলো—২, ৪, ১০, ১৮, ৩৮, ৬০, ৯৩% কোডাক গ্রে, সৃষ্টি হলো টোনের সরগম, আলোর বৃন্দবাদন । স্পর্শ করলো 'ডি লগ ই' কার্ভের টো থেকে সোলডার পর্যন্ত । 'ডি লগ ই'-এর সম্পূর্ণ এক্সপোজার পরিসর। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সৌমেন্দু রায় 'ঘরে-বাইরে', ছবির আলোকায়ন সম্বন্ধে বলেছেন, প্রথমে তাঁরা সন্দীপ, নিখিলেশ এবং বিমলার জন্য তিনটি ভিন্ন স্তরের আলোর পরিকল্পনা করেছিলেন । এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে সত্যজিৎ রায়ের আঁকা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অর্কেস্ট্রা কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদ । তিনটে ভিন্ন ধরনের অ(রের('টাইপফেস' এর বৃন্দবাদন।

চিত্রনাট্যের বিন্যাসে, পরিচালকের প্রকাশ ভঙ্গিতে জীবনবাবুর সঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রের সম্পর্ক, গু(ত্ব অনুযায়ী, 'নরা'র মত তাদের চেয়ারে বসার অবস্থানও ত্র(মে বদলাতে থাকবে এবং একই সঙ্গে 'রক্ত(করবী'র বিভিন্ন স্কেলে সংলাপ বলার মতই প্রতিটা চরিত্রের আলোর স্তর বিন্যাসও পাল্টে যাবে । ফলে, সৃষ্টি হবে কনট্রাস্ট এবং টোনের এক আশ্চর্য আলোর বৃন্দবাদন, আলোর ভাষা । যাকে বলা হয় আলো দিয়ে আঁকা । আলোর স্তর বিন্যাসই বলে দেবে চরিত্রগুলির স্বরূপ । ত্র(মে কাছের জন হয়তো চলে যাবে দূরে, অন্ধকারে, দূরের অন্ধকারের জন হয়তো পাশে এসে বসবে আলোতে নাটকের, চিত্রনাট্যের টানাপোড়েনে।

লাইটস্কীমের গোপন রহস্য আসলে গূঢ়তর অর্থে কাহিনীকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করার জন্য চিত্রনাট্যের মত 'আলোর চিত্রনাট্য' রচনা । 'যে রাস্তা দিয়ে অপু দুর্গার হাত ধরে প্রথম দিন স্কুলে গেছিল, দুর্গা মারা যাবার পর সেই রাস্তা দিয়ে অপুকে একা স্কুলে যেতে দেখলে দর্শকদের কাছে দুর্গার মৃত্যু, অভাবটা আরো প্রকট হয়ে উঠবে'—এই যে চিত্রনাট্যের বিন্যাস, সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টিভঙ্গি, পরিবেশের ব্যঞ্জনা—এদের সঙ্গী কি আলো হতে পারে না ? চিত্রনাট্যের অপরিহার্য বিন্যাসের মত লাইটস্কীমের অন্যতম শর্ত পরিকাঠামোর মধ্যে সঙ্গোপনে ইঙ্গিতবহ হয়ে গাণিতিক এবং জ্যামিতিক বিন্যাসে স্বরচিত আরোপকে (আর্টস্কীমকে) গোপন করে বাস্তবতাকে প্রকাশ করা । আলো নিয়ন্ত্রণ করবে এক্সপোজার, সৃষ্টি হবে প্রকৃত পরিবেশ, দিন-রাত্রির নির্দিষ্ট সময়-আলো, আলো-ছায়া, ছায়া, অন্ধকার হয়ে উঠবে ব্যঞ্জনাময় । রচিত হবে আলোর স্বতন্ত্র নিজস্ব ভাষা । সৃষ্টি হবে আর এক শিল্পকলা ।—সিনেমাটোগ্রাফি ।

অনেক পরিচালক নিজে ক্যামেরা চালান । সিনেমাটোগ্রাফার নন এমন পরিচালকরা ক্যামেরা চালানোর দায়িত্ব নিয়ে নিজেদের ছবির (তিই করেছেন । যেমন সত্যজিৎ রায় । অনেক সিনেমাটোগ্রাফাররাও ক্যামেরা চালনায় তেমন পারদর্শী নন। অশোক মেহেতা একজন প্রথম শ্রেণীর সিনেমাটোগ্রাফার । ক্যামেরা চালনায়ও যথেষ্ট দ(। কিন্তু তথাপি তিনি 'ব্যান্ডিট কুইন' ছবিতে ততোধিক দ(একজন অপারেটিভ ক্যামেরাম্যান সঙ্গে নিয়েছেন । এবং অসাধারণ কাজ করেছেন। ক্যামেরা চালনা একটা বিশেষ দ(তা, পারদর্শিতা । সব সিনেমাটোগ্রাফার ক্যামেরা চালনার চূড়ান্ত দ(তায় পৌঁছাতে পারেন না । বিশেষ করে বিদেশে, আমাদের দেশেও ক্যামেরাচালক বিশেষজ্ঞ আছেন । ছবির উৎকর্ষের জন্য প্রথম শ্রেণীর সিনেমাটোগ্রাফাররা বিশেষজ্ঞ ক্যামেরাচালককে সঙ্গে নিয়ে কাজ করেন । অনেকটা ডাবিং পারদর্শীর ব্যবহারের মত ।

চলচ্চিত্র পরিচালকের মাধ্যম এবং একই সঙ্গে দলগত সৃজন প্রয়াসও বটে । তাই পরিচালক 'ক'-এর সঙ্গে সিনেমাটোগ্রাফার 'ক'-এর এক রকম সম্পর্ক এবং পরিচালক 'খ'-এর সঙ্গে সিনেমাটোগ্রাফার 'ক'-এর আর এক রকম সম্পর্ক । এই সম্পর্ক শুধু চলচ্চিত্র, পরিচালক, সিনেমাটোগ্রাফারের (ে ত্রেই নয়, জীবনের সব (ে ত্রেই প্রযোজ্য এবং সত্য। জীবনরহস্য। প্রকৃতির নির্বাচন।

।। সিনেমাটোগ্রাফি — সত্যজিৎ রায় এবং সুব্রত মিত্র ।।

'পথের পাঁচালী' ভারতীয় চলচ্চিত্রের নব দিগন্ত । সিনেমাটোগ্রাফির ে(ত্রে 'পথের পাঁচালী' থেকেই শু(হয়েছিল চলচ্চিত্রে স্বাভাবিক আলোকায়ন পদ্ধতির প্রবণতা । পথের পাঁচালীর আগে কোন কোন ছবিতে দুই একটা দৃশ্যে বি(প্ত ভাবে স্বাভাবিক আলোকায়ন পদ্ধতির ল(ণ দেখা গেলেও সেগুলি ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র । তার মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত কোন শৈল্পিক পরিকল্পনা ছিল না । কিন্তু পথের পাঁচালীতে ছিল পূর্ব পরিকল্পিত আলোক বিন্যাস পরিকল্পনা । মূলত প্রতিটি ছবিতে যে একটা পূর্ব পরিকল্পিত আলোক বিন্যাস পরিকল্পনা থাকে, প্রতিটি ছবির জন্য যে আলাদা ভাবে ছবির ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে আলোক বিন্যাস পরিকল্পনা করতে হয়—এটাই সেদিন 'পথের পাঁচালী' ভারতীয় চলচ্চিত্রকে শিখিয়ে ছিল ।

পথের পাঁচালীতে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র বোধ যেমন আমাদের অবাক ও সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি সুব্রত মিত্রের অসাধারণ 'আলোকায়ন' পদ্ধতি, টেকনিক্যাল জ্ঞান, এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণ ভারতীয় চলচ্চিত্রে সৃষ্টি করেছে সিনেমাটোগ্রাফির নতুন দিগন্ত যা পরে অধিকতর সমৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—'সুব্রত মিত্রের ঘরাণা' ।

পথের পাঁচালী শু(করার আগে সত্যজিৎ রায় নীতিন বসুর দ্বিভাষিক ছবি—রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' এবং রেনোয়ার 'দি রিভার' ছবির সুটিং দেখেছিলেন । এ ছাড়া ছবি তৈরির কোন প্রত্য(অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না । 'দি রিভার' ছবির 'ক্যামেরা-অবজারভার' ছিলেন সুব্রত মিত্র । এঁরা দুজনেই ছিলেন স্থির আলোকচিত্রী । ছোটবেলায় সত্যজিৎ রায় স্থির আলোকচিত্রের জন্য পুরস্কারও পেয়েছিলেন । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সুকুমার রায় (সত্যজিৎ-পিতা) ছিলেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃত স্থির আলোকচিত্রী। রয়েল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটির সদস্য দ্বিতীয় ভারতীয় ।

পথের পাঁচালী শু(র আগে একদা সত্যজিৎ রায় সুব্রত মিত্রকে বলেছিলেন—'এ ছবি হলে নিমাই ঘোষ ক্যামেরাম্যান হবেন এবং তোমাকে এটুকু কথা দিতে পারি যে তুমি তার থার্ড কিংবা ফোর্থ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ পাবে ।' যে কোন কারণেই হোক নিমাই ঘোষের বদলে সুব্রত মিত্রই সিনেমাটোগ্রাফার হিসাবে তাঁর প্রথম ছবি পথের পাঁচালীর কাজ শু(করলেন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে । যখন নিমাই ঘোষকে পাওয়া গেল না, তখন সত্যজিৎ রায় সুব্রত মিত্রকে বললেন—'তুমিই ফোটোগ্রাফিটা কর না ।'

এর উত্তরে সুব্রত মিত্রের প্রধান যুক্তি(—'আমি তো সিনেমাটোগ্রাফির ব্যাপারে কিছুই জানি না' । সত্যজিৎ রায়ের মন্তব্য—'তুমি তো স্টীল ফোটোগ্রাফি করই, আর তফাৎটা কোথায় ? এখানে শুধু একটা সুইচ টিপলেই ক্যামেরাটা চলে এই যা তফাৎ, বাদ বাকি তো সব এক, তাই না ?

এই পরিপ্রে(তে সুব্রত মিত্রের মতামত—'মানিকদার এই কথাগুলো মোটেই ঠিক না, সেটা সেদিন তাঁকে বোঝাতে না পারলেও, সুটিং শু(হতেই তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলাম । স্টীল ফোটোগ্রাফিতে ক্যামেরা বা সাবজেক্ট কেউ নড়ে না। কিন্তু মুভিতে যেহেতু দুটোই চলাফেরা করে আর একই শটে অভিনেতাদের নানা রকম লাইটিং কনডিশনের মধ্যে ধরতে হয়, তাই প্রবলেমটা সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের । এ ছাড়া আরও নানান সমস্যা তো আছেই । কিন্তু তখন আর ফেরার উপায় নেই।'

১৯৬৬ সালে সত্যজিৎ রায় তাঁর ক্যামেরাশৈলী, সিনেমাটোগ্রাফি সম্বন্ধে লিখেছিলেন—''এই একটি ে(ত্রে শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব, কলাকৌশল এবং কারিগরি বিদ্যাকে আলাদা করে সহজে দেখা যায় না । বিশেষ কোন লেন্স-এর ব্যবহার, বিশেষ

কোন ফিল্ম-এর কাঁচা মাল ব্যবহার, ডায়াফ্রামের ব্যবহার, ফিলটার, আলোর ব্যবহার এইগুলি পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নের সঙ্গে জড়িত কলাকৌশল, আবার এই গুলিই নন্দনতত্ত্বের গূঢ়তম দিক, যা কিনা ছবির মেজাজ এবং বুনুনিটা এনে দেয় ।

গল্পের মেজাজ থেকেই ছবি তোলার শৈলীটা উদ্ভূত হওয়া উচিত । পরিচালকের জানা উচিত তিনি কি চান । সেই জানাটা ক্যামেরাম্যানকে কলাকৌশলের ভাষায় পরিষ্কার বুঝিয়ে দেবার (মতা থাকা উচিত ।

সবচেয়ে ভাল হয় পরিচালক নিজে যদি ক্যামেরাম্যান হন । নিদেনপ(ক্যামেরাম্যানের মাথায় নিজের চিন্তাধারাটা চাপিয়ে দিতে পারেন । ফ্ল্যাহার্টি তাঁর কয়েকটি মহত্তম ছবিতে ক্যামেরার কাজ নিজেই করেছিলেন । অরসন ওয়েলস নিজের ছাপ ছবি তোলাতে এমন ভাবে দেগে দিয়েছিলেন যে সিটিজেন-কেন-এ গ্রেগ টোলান্ড-এর মত প্রবীণ ক্যামেরাম্যানের কাজও ম্যাগনিফিসেন্ট অ্যাম্বারসন-এর স্ট্যানলি কাজের সঙ্গে তফাৎ করে বোঝা যায় না । ফোটোগ্রাফি যদি ছবির বক্ত(ব্যকে ফোটাতে পারে তবেই তা-ভাল, আর না পারলেই মন্দ । (তা সে যতই চাকচিক্যময় কারিকুরিওয়ালা, দর্শনধারী হোক না কেন) যত(ণ পর্যন্ত না আবেগ দিয়ে এবং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে গোটা ছবিটার কাঠামো ভেসে উঠছে, তত(ণ ক্যামেরাম্যানের প(কোনও সাজেশন দেওয়া বিপজ্জনক । তার আগে পর্যন্ত পরিচালকের কথা মেনে চলাই উচিত । খুডার অত্যন্ত ভাল ক্যামেরাম্যান, কারণ তিনি নিজের ব্যক্তি(সত্তা বিসর্জন দিয়ে গোদারকে মেনে চলতে রাজি । গোদারের চিন্তা যতই বিজাতীয় হোক, সবসময়েই সেটা চিত্তাকর্ষক, অতএব সম্মানের যোগ্য । পরিচালকের পার্থক্যে ক্যামেরাম্যানের কাজেও পার্থক্য ঘটে। যে পরিচালক দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যাপারগুলোতে কাঁচা, তাঁকে হয়তো নাটকীয়তাবোধসম্পন্ন ক্যামেরাম্যান অমূল্য সাহায্য করতে পারেন । যেখানে পরিচালকই কর্তা, প্রযোজনার প্রত্যেক ((ত্রেই যার কথা অবধারিত, সেখানে ক্যামেরাম্যান একজন ব্যাখ্যাকারী । তার বেশি কিছু করতে গেলেই পরিচালককে সর্বব্যাপী কর্তৃত্ব থেকে সরে আসতে হয় । ভাল 'সেট', ভাল যন্ত্রপাতি, ভাল কাঁচামাল, ভাল রসায়নাগারে কাজ, ভাল ছাপা, ভাল ছবি তোলার প(এ সবই অপরিহার্য । এক ধরনের ছবি আছে, যাদের জন্য সবকিছুই একেবারে প্রথম শ্রেণীর না হলেও চলে । ডিসিকার গোড়ার দিকের ছবিগুলি সুষ্ঠুভাবে হয়েছিল, তার দরকারও হয়েছিল,—ত্রুটিপূর্ণ নিম্ন শ্রেণীর যান্ত্রিক জিনিসপত্র সত্ত্বেও । কিন্তু মাক্স ওফালসের ছবিতে একেবারে নিখুঁত উচ্চতম মানের চিত্রগ্রহণ ছাড়া ((কিছু কল্পনাই করা চলে না ।

'সুন্দর' চিত্রগ্রহণ সম্পর্কে চিরাচরিত ভাবধারা এখন মরণ-উন্মুখ, কিন্তু অবাক কাণ্ড—তার কিছু অংশ আজও টিঁকে আছে। যেমন সর্বাবস্থায় সবসময়ে নায়িকার মুখ 'সুন্দর' করে তুলতেই হবে । এ ব্যাপারটাকে ব্যবসার দিক থেকে অপরিহার্য বলে মনে করা হয় । কিছু কিছু চলচ্চিত্র নায়িকা এই অভ্যাসের ফলে এত লাই পেয়ে গেছেন যে, কোন ক্যামেরাম্যান যদি তাদের মত মুখের 'ঠিক অ্যাঙ্গেল'টি না জানেন তাহলে সে সব ক্যামেরাম্যানদের তারা সহ্যই করতে পারেন না । এমনকি সময় সময় সবচাইতে ভাল ক্যামেরাম্যানও এই লোভ সম্বরণ করতে পারেন না—হয়তো অত্যন্ত সুডৌল একটা মুখকে গুছিয়ে আলো করার লোভে, কখনও বা কোন একটি অসুন্দর মুখকে সুন্দর করে তোলার লোভে, এই অনাবিল আনন্দ । এর মারাত্মক একটা দিক আছে এবং একজন ক্যামেরাম্যান, যিনি 'সুন্দর-সুন্দর' শট নেওয়া থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারেন না, অনেক সময় ছবিটার বি(দ্ধেই তাঁর ভাল ছবি তোলা চলে যায় ।

চা(লতার পর থেকেই আমার ক্যামেরা আমি নিজেই চালাই । এর কারণ এই নয় যে, আমার ক্যামেরাম্যানের ক্যামেরা ঘোরানো-ফেরানোর (মতায় আমার আস্থার অভাব আছে । এর কারণ আমি জানতে চাই, প্রতি মুহূর্তে আমার শট ঠিক কী ভাবে চলছে । ব্যক্তি(গত অভিনয়ের দিক থেকেই নয়, বিভিন্ন অভিনেতার পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিত্তি ক্যামেরার একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ নির্ধারিত করে দেয় সেই দিক থেকেও বটে । এই পারস্পরিক সম্বন্ধ একটি শটের মধ্যেই অভিনেতাদের মধ্যে বারবার বদলে যেতে পারে, অথবা ক্যামেরার গতির জন্য বদল হতে পারে অথবা দুটো কারণই একত্রে ঘটতে পারে। একমাত্র একটি দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্যাপারটিকে সঠিকভাবে ওজন করা যায় । সে হচ্ছে 'লেন্স'-এর মধ্যে দিয়ে । নতুন নতুন 'লেন্স', যেখানে সেখানে সঙ্গে নিয়ে ঘোরার মতো আলোর ব্যবস্থা, 'ট্রাক্' এবং 'প্যান' করার নতুন কৌশল,—আমি অনুভব করি যে এই সমস্ত ক্যামেরার বলার (মতাকে জোরদার করছে । 'জুম' হচ্ছে একটি চমকপ্রদ আবিষ্কার । এ শুধু 'ট্রাক' করার সময়সং(পের যন্ত্রই নয়, বরং নিজস্ব গুণেই এক শক্তি(শালী নব-নব উন্মেষের হাতিয়ার ।

আমার ক্যামেরাম্যান সুব্রত এক নতুন পদ্ধতিতে আলো করার রাস্তা বের করেছে এবং নিখুঁত করে তুলেছে । যাতে করে স্বাভাবিক সূর্যালোকের অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর অনুকরণ করা যায় । এই পদ্ধতি এমন এক চিত্রগ্রহণের কায়দার জন্ম দিয়েছে, সেটা সত্যসন্ধি, চোখকে আঘাত করে না এবং আধুনিক । বাস্তবধর্মী চিত্রের প(এই পদ্ধতি যে অত্যন্ত কার্যকর এই বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই ।''

কিন্তু সুব্রত মিত্র কাজ ছেড়ে দেবার পর 'জেমস ব্লু-কে এক সা(াৎকারে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন—''সুব্রত মিত্র আর ওঁর সহকারী যিনি এখন আমার ক্যামেরার কাজ করছেন—আমরা সবাই মিলে আলোকসম্পাতের একটা প্রক্রি(য়া আবিষ্কার করেছিলাম । যা দিয়ে আমরা স্টুডিওর মধ্যেই দিনের আলো আশ্চর্য নকল করতে পারি । প্রত্যেকের, এমনি কি সেরা পেশাদারদেরও ধাঁধা লেগে যায় । ওটা কিন্তু এক ধরনের নকল আলো । যদি দিনের দৃশ্য হয় তবে আমরা যেটুকু আলো পাওয়া উচিত তাই অনুসরণ করি । সোজাসুজি রোদ্দুর ফেলে নয়, তার বদলে আমরা বরাবর প্রতিফলিত আলোর (Bounce light) সাহায্য নিই। বিশেষ করে আপনি যদি 'চা(লতা' দেখে থাকেন—অনেকদিক থেকে ওটাই আমার সেরা ছবি । 'অপুর সংসার'-এ অপুর ছোট্ট ঘরে যে লোকেশন সুটিং-এর পরিমণ্ডল রচনা একেবারে বাস্তব বলে বি(্বাস হবে—তার মূলেও আমাদের আলোকসম্পাত প্রণালী । অথচ আসলে স্টুডিও সেটে তোলা জানলা দিয়ে বা ক্যামেরার পাশ থেকে যে আলো ফেলা হয় তা ওই প্রতিফলিত আলো দিনের ভিন্ন ভিন্ন সময় বোঝাবার জন্য খুব সাবধানে পরিমাপ করে নেওয়া। এখানে ওখানে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় শাদা কাগজ ব্ল্যাকবোর্ডের মতো হয়তো টাঙিয়ে দেওয়া হল । আবার নানাধরনের কাগজ কোনটা মেঘলা দিনের জন্যে, কোনটা রোদ্দুরের জন্যে, কোনটা দুপুরের, কোনটা খুব ভোরের । এও এক ধরনের আলোকসম্পাত আর কি । 'অপুর সংসার'-এ আলোর সামঞ্জস্য হয়েছে অসাধারণ । অবশ্য সামঞ্জস্য শুধু আলো ফেলার দ(ণই হয় না । সাউণ্ড-ট্র্যাকও বরাবর ঠিক ঠিক মেলাতে হয়। কেননা একটা শট থেকে আরেক শটে শব্দের ধারাসংগতি বজায় রাখতে হয় ।

আমেরিকান সিনেমাটোগ্রাফার-এ একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম । Sven Nyqvist-এর লেখা । উনি বার্গম্যানের ক্যামেরাম্যান। 'থ্রু এ গ-াস ডার্কলি' (১৯৬১) ছবিটির সুটিং সবেমাত্র শেষ করেছেন ওঁরা । প্রতিফলিত আলো ব্যবহারের যে আশ্চর্য পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন তারই সবিস্তার বর্ণনা দিয়েছেন । আমরা গত বারো বছর ধরে যা ব্যবহার করে আসছি ।

যা বলছিলাম । অপুরা কাশীর যে বাড়ির বাসিন্দা, সেটা একটা স্টুডিও সেট । ওপর থেকে এসে পড়া আলোর জন্যে মাথার ওপরে একটা কাপড় মেলে দিয়েছিলাম টান টান করে । আর তার জন্যেই জায়গাটা অন্ধকার কোটরের মতো মনে হয় । তাতে বাস্তবিক কিছু এসে যায় না । সবাইকে সুন্দর রূপে সাজাতে হবে এমন নয় । শেষমেশ এতে কাজ হয় । যেহেতু একটা বাস্তবধর্মী মেজাজ আগাগোড়া থেকে যায় । ওইসব টিনের রাংতা আর (পোলি কাগজের রিফ্লেক্টর ওগুলি অবশ্য না হলে নয়, তবু এমনকি লোকেশনে গিয়ে আমরা যা করতাম তা হলো সমস্ত ক্লোজশটের জন্য ওসবের বদলে সাদা কাপড়ের বিরাট থান টাঙিয়ে দেওয়া যাতে ঠিকরে আসবে নরম আলোর প্রতিফলন । রঙীন ছবি 'কাঞ্চনজঙঘা'-য় হোটেলের ভেতরের দৃশ্যাবলী তোলা হয়েছিল । কিন্তু রঙের জন্যে কোনো আলো আমাদের কাছে ছিল না । তখন আমরা করলাম কি, দু-তিনটে প্রকাণ্ড সাইজের আয়না, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে চারফুট করে প্রায়, তাই কাজে লাগিয়ে দিলাম । সূর্যর(্মি প্রতিফলিত করে এনে ফেললাম ঘরের মধ্যে সোজা সেই টাঙিয়ে রাখা কাপড়ের ওপর । ফল হলো একেবারে চমৎকার । তবে এরকম করতে গেলে অবিশ্যি সূর্যের আলো থাকা চাই । মেঘলা দিন হলেই সব মাটি । কিন্তু যদি রোদ্দুর আর আরশি থাকে তবে সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে ফেলুন । ফল যা পাবেন তাতে খাটুনি পুষিয়ে যাবে । ধারে কাছে যে আদৌ আলো আছে তা টের পাওয়া যাবে না । খুচরো হাবিজাবি চকচকে আসবাব উপকরণে আলো পড়ে চিকচিক করবে না ।''

এই বিষয়ে সৌমেন্দু রায় আমাদের জানিয়েছেন—'সুব্রত মিত্রও এক নতুন ধরনের আলোর পরিকল্পনা করেছিলেন—যাকে আমরা বলে থাকি 'বাউন্স লাইট' বা শ্যাডোলেস লাইট (ছায়াহীন আলো) । সুব্রত মিত্রের এই নতুন ধরনের আলোর গোপন রহস্য আমার মনে হয় জঁ রনোয়ার 'দা রিভার' ছবির সুটিং পর্যবে(ণের ফল । রামানন্দ সেনগুপ্ত আমাদের

জানিয়েছেন—'চার্লস পুলটনের পর আলোকচিত্রশিল্পী ক্লড রনোয়ার কথা এসে যায় । ঘরের বাইরে দিনের আলোতে, দৃশ্য গ্রহণের সময় ক্লড কীভাবে আলো ব্যবহার করতেন, শুধু সেটাই এখানে বলব । প্রখর রোদে ছবি তোলার প্রধান সমস্যা হল ছায়া । রোদে যত তেজ, ছায়া তত ঘন কালো । সুতরাং সে (্ত্রে সূর্য মাথার উপর থাকলে, কপালের ঘন কালো ছায়ায় চোখ প্রায় দেখাই যায় না । তাছাড়া নাকের ছায়াটি ঠোঁটের মাঝখানে বিশ্রী একটা কালো ছাপ ফেলে । সূর্য যদি অপে(াকৃত কোনাচে ভাবে থাকে, তখনো নাকের ছায়া ঠোঁটের কোনায় থেকে যাবে । সুতরাং ছায়ার সমস্যা দূর করার জন্য বিরাট চাঁদোয়া ব্যবহার করা হতো । হালকা সাদা কাপড়ের চাঁদোয়া তৈরি হতো, তাতে সূর্যের আলো শিল্পীদের মুখে কোন ছায়া সৃষ্টি করত না, অথচ তাঁরা আলোকিত হয়ে যেতেন । এরপর আর্ক ল্যাম্পের সাহায্যে শিল্পীদের বিশেষভাবে আলো দেওয়া হতো ।'

এ ছাড়াও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়কে এক সা(াৎকারে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন ''...আমার সব অবস্থাতেই নিজের কন্ট্রিবিউশান থাকে । ক্যামেরাতেও তাই, কেন না আমি নিজে চোখ লাগিয়ে ক্যামেরা চালাই । ভাল ক্যামেরাম্যানের সঙ্গেই আমি কাজ করে এসেছি চিরকাল । লাইটিংটা তারা ভাল করতে পারেন । সেটা একটা বড় দায়িত্ব । সেখানে সেই ক্যামেরাম্যানের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে । তাও শেষ পর্যন্ত লাইটিং হলে আমার একটা অনুমোদন প্রয়োজন হয় ।''

ল(ণীয় 'মহানগর', 'চা(লতা' ছবি থেকে (কোন্‌টি ঠিক ?) সত্যজিৎ রায় নিজে ক্যামেরা চালাচ্ছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর সম্মতি ছাড়া ক্যামেরাম্যান স্বাধীন ভাবে আলো করতে পারছেন না । সত্যজিৎ রায় নিজে ক্যামেরা চালানোর দায়িত্ব নেওয়াতে তাঁর কী উপকার হয়েছে জানি না । তবে প্রমাণিত হয়েছে তিনি তৃতীয় শ্রেণীর ক্যামেরা অপারেটর । সত্যজিৎ রায়ের ক্যামেরা চালনা যে সন্দীপ রায়ের ক্যামেরা চালনা থেকে অনেক খারাপ এবং সুব্রত মিত্র কাজ ছেড়ে দেবার পর থেকে তাঁর ছবির সিনেমাটোগ্রাফির মান যে দিন দিন খারাপ হয়েছে এটা নিশ্চয় সমঝদার দর্শকের কাছে প্রমাণ করতে হবে না । সত্যজিৎ রায় নিজেই বলেছেন—'অরসন ওয়েলস নিজের ছাপ ছবি তোলাতে এমন ভাবে দেগে দিয়েছিলেন যে সিটিজেন কেন-এ গ্রেগ টোলান্ডের মত প্রবীণ ক্যামেরাম্যানের কাজও ম্যাগনিফিসেন্ট অ্যাম্বারসন-এ স্টানলি কাটারের কাজের সঙ্গে তফাৎ করে বোঝা যায় না ।' দুঃখের বিষয় সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে সুব্রত মিত্র, সৌমেন্দু রায়, ব(ণ রাহার কাজ আলাদাভাবে বোঝা যায়। 'গণশত্রু'র সিনেমাটোগ্রাফি তো বসে দেখা যায় না । সিনেমাটোগ্রাফির (্ত্রে সত্যজিৎ রায়ের (মতা ছিল সীমাবদ্ধ । এই ব্যাপারে তিনি চরম ব্যর্থ হয়েছেন ।

ইদানীং পৃথিবী জুড়ে সিনেমাটোগ্রাফার এবং পরিচালকরা নাকি 'জুম লেন্স' ব্যবহারের বি(দ্ধে সোচ্চার । কিন্তু জুম লেন্স না থাকলে তো 'চা(লতা' ছবিটা বোধহয় কোন দিনই শেষ হতো না । সত্যজিৎ রায়ের মতে 'চা(লতা' তাঁর সেরা ছবি । ছবিটা নাকি নিখুঁত । কিন্তু 'চা(লতা'-র বেশিরভাগ প্যান, টিল্ট, জুম অপারেশন তো নিখুঁত নয় । সব ফ্রেমগুলি অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে । শট গুলি তো রীতিমত এন.জি । একমাত্র নিজে পরিচালক, অপারেটিভ ক্যামেরাম্যান বলেই...হায় ইগো !

অথচ সুব্রত মিত্র যখন অন্য পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন, যত দিন গেছে দিন দিন সুব্রত মিত্র উন্নতি করেছেন । প্রথম শ্রেণীর দ(তার, প্রতিভার চূড়ান্ত স্বা(র রেখেছেন । সিনেমাটোগ্রাফিতে নিজস্ব ঘরাণা সৃষ্টি করেছেন । সুব্রত মিত্রের সিনেমাটোগ্রাফি শুধু ভারতীয় সিনেমাটোগ্রাফারদেরই অনুপ্রাণিত করেনি, কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত ইউরোপীয় সিনেমাটোগ্রাফারও তাঁর কাজে অনুপ্রাণিত এবং প্রভাবিত হয়েছেন । গোবিন্দ নিহালনী জানাচ্ছেন—''সুব্রত মিত্রের সাদা-কালো আলোকচিত্রণ সত্যজিৎ রায়ের ছবির খুবই উল্লেখযোগ্য উপাদান । স্বাভাবিক আলোকায়ন ঘরাণার কতগুলি উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় চিত্রকল্প আছে পথের পাঁচালী, অপরাজিত, অপুর সংসার এবং চা(লতা ছবিতে । সুনির্দিষ্ট সুসম্পাদিত স্বাভাবিক আলোকচিত্রায়ণ, দৃশ্য সংগঠন, চূড়ান্ত দ(ক্যামেরা চালনা সুব্রত মিত্রের কাজকে একটা বিশেষ চরিত্র দিয়েছে । তার কাজ ইউরোপীয় সিনেমাটোগ্রাফারদেরও অনুপ্রাণিত-প্রভাবিত করেছে ।

১৯৮০-৮১ সালে নিউইয়র্কের মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট ভারতীয় চলচ্চিত্রের যে বিশাল প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল, সেখানে আমি বিখ্যাত সিনেমাটোগ্রাফার নেসটোর আলমিডোরস-এর সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম।

নেসটোর আমাকে বলেছিলেন, 'যদিও আমি প্যারিসের ফিল্মস্কুলে সিনেমাটোগ্রাফি শিখেছি, তথাপি 'চা(লতা'র সিনেমাটোগ্রাফি দেখে আমি সম্পূর্ণ সম্মোহিত হয়ে গেছিলাম ।' সা(ৎকারের মাধ্যমে সুব্রত মিত্র কেমন করে এই ধরনের আলো উদ্ভাবন করেছেন এটা জানতে পেরে তাঁর খুব উপকার হয়েছিল এবং তিনি তখন ফিল্মস্কুলের কয়েকটা পরী(ামূলক ছবিতে ঠিক একই পদ্ধতিতে আলোকায়ন করেছিলেন । এর ফলস্বরূপ তাঁর কয়েকজন ছাত্রবন্ধু, এমন কি কয়েকজন শি(কও ভেবেছিলেন এটা বোধহয় তাঁর নিজস্ব আশ্চর্য পরী(া । সুব্রত মিত্রের প্রতি দা(ণ মুগ্ধতা এবং গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে জানিয়েছিলেন—'তারপর থেকে আমার সব কাজেই এই ভাবে প্রভাবিত হয়েছি—যে অনুপ্রেরণা আমি পেয়েছিলাম চা(লতার আলোকচিত্রায়ণ দেখে ।''

সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর পর অপর্ণা সেন আমাদের জানাচ্ছেন—'আর একটা শটের কথা উল্লেখ না করলে বক্ত(ব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায় । নীচের নদী থেকে ডায়াগন্যাল ট্র্যাক ধরে পাড়ের ওপর ঘুমন্ত অপুর মুখ । নদীর উপস্থিতি অপর্ণার বাপের বাড়িতে দৃশ্যগুলিতে সর্বময়, এবং সারা ছবিতে সুব্রত মিত্রের তাঁর ক্যামেরার কাজ ছবিটির একটি অমূল্য সম্পদ ।'

এখানে যেটা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, আমাদের দেশের অনুন্নত রসায়নাগার, পুরানো ক্যামেরা দিয়ে সিনেমাটোগ্রাফি করে ইউরোপীয় সিনেমাটোগ্রাফারদের অনুপ্রাণিত করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করায় যে কী ধরনের প্রতিভা দ(তা এবং জ্ঞানের প্রয়োজন সেটা যারা সিনেমাটোগ্রাফির সঙ্গে যুক্ত(তারাই একমাত্র উপলব্ধি করতে পারবেন । বস্তুত ভারতীয় সিনেমাটোগ্রাফাররা যে অবস্থা, যে যন্ত্রপাতি, যে রসায়নাগারে কাজ করেন, তাতে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির স্বপ্নও দেখেন না। সুব্রত মিত্রই একমাত্র এশিয়াবাসী সিনেমাটোগ্রাফার, যার অসাধারণ আলোকচিত্রায়ণ এবং সিনেমাটোগ্রাফির জন্য ১৯৯২ সালে 'হাওয়াই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি' 'ইস্টম্যান কোডাক' পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছে ।

বিরানব্বই সালের আগে একমাত্র অভিনেতা ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় ছাড়া কোন ভারতীয় সত্যজিৎ রায়ের সিনেমাটোগ্রাফি সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করেছেন এটা আমার জানা নেই । ধৃতিমান মনে করেন—

''ঘরে বাইরে-র technical দিকটা এবারে দেখা যাক । ধরা যাক 'অশনি সংকেত' ছবির photography-র কথা । সেখানে আমার মনে হয়েছে উনি যে colour photography করতে জানেন এটা দেখিয়ে দিয়েছেন । Exposure কি দিলে colour ঠিক আনা যায় এটা উনি দেখিয়েছেন । সেইটুকুই ওঁর উদ্দেশ্য ছিল । কিন্তু 'ঘরে বাইরে'-তে আমার মনে হলো এখানে বোধ হয় framming -এ, camera movement-এর মধ্যে দিয়ে visually cinematic করতে চেষ্টা করেছেন । অনেকটাই সফল হয়েছে । তবে আমার মনে হয় উনি নিজে camera operate না করলে যা ভেবেছিলেন সেটা আরও ভালোভাবে realised হতো । আসলে এখানে উনি photography-কে epic style -এ করতে চেয়েছিলেন। যেটা হয়তো ওঁর শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে সবসময়ে ফুটে ওঠেনি । হয়তো একটু exaggeration হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমার মনে হয় camera movement-এর ব্যাপারে Max Ophuls-এর মধ্যে আমরা যে fludity পাই, অনেকটা সেই জাতের movement এখানে আনতে চেয়েছিলেন । নিখিলেশ-বিমলার দৃশ্যে যে fludity-র কথা উনি ভেবেছিলেন সেটা করতে গেলে যে যোগাড়-যন্ত্র করতে হয় সেটা এখানে ছিল না । এখন, শারীরিক অ(মতার ব্যাপারে তো আর বিচার চলে না। একপ(যেমন বলা যায় একজন camera man থাকলে ভালো হত অন্য দিকে আবার এটাও বলা যায়, উনি সেরকম প্রয়োজন অনুভব করেননি । এ ব্যাপারে তো আর value judgement apply করা যায় না ।''

এখন প্র(ু হলো, অনেকের কাছেই রহস্যময় যে সুব্রত মিত্র কেন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজ করা ছেড়ে দিলেন ? এই বিষয়ে সত্যজিৎ রায় কোথাও কিছু বলেছেন, বা লিখেছেন কিনা জানি না । সুব্রত মিত্র আমাদের জানিয়েছেন—'আমি তাঁর সঙ্গে কাজ করা বন্ধ করেছিলাম, কারণ তিনি আমার কাজে খুব বেশি ইন্টারফেয়ার করতে শু(করেছিলেন ।' আমাকে বলেছেন—'শিল্প নির্দেশক আলোকচিত্রী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্পর্কটা বন্ধুত্বের এবং সহযোগিতার । কারণ চলচ্চিত্র একটা যৌথ শিল্পকর্ম । তাই নিটোল দলগত সংহতি ছাড়া একটা সার্থক ছবি তৈরি হতে পারে না । এবং কোন শিল্পীর কাছ থেকেই চূড়ান্ত ফল আশা করা যায় না । অনেক পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছি । সবার সাথেই কাজ করে আনন্দ পাই । তবে কেউ কেউ আলোকচিত্র সম্বন্ধে একটু বেশি বোঝে । অতটা বেশি বোঝা উচিত না । বুঝতেই পারছেন আমি মানিকদার কথা বলছি, মানিকদা বোঝে—নো ডাউট বোঝে । তবে একটু বেশী বোঝে । অতটা বেশি বোঝা ওঁর উচিত না। শেষের দিকে আমার কাজে খুব বেশি ইন্টারফেয়ার করতেন । তাই আর কাজ করলাম না । ছেড়ে দিলাম ।'

প্রসঙ্গত, সত্যজিৎ রায়ের এই মন্তব্যটা প্রাসঙ্গিক মনে করি—''কেন আমি 'পেশাদার' সঙ্গীত পরিচালকদের সঙ্গে আর কাজ করি না, তার কারণ হচ্ছে যে আমি নিজে বেশি সৃষ্টিশীল সাঙ্গীতিক চিন্তায় বিভোর হয়ে যাই । স্বভাবতই সঙ্গীত-পরিচালকরা বেশি-বেশি পরিচালনা সহ্য করতে নারাজ । সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব হয়তো স্বহস্তে গ্রহণ না করলেও পারতাম । কিন্তু বন্ধু-বিচ্ছেদের ভয়ে এবং আমার নিজস্ব চিন্তার সঙ্গে সঙ্গীত পরিচালকের চিন্তার পার্থক্য হেতু এই সিদ্ধান্ত আমায় গ্রহণ করতে হয়েছে ।''

সুব্রত মিত্রের অভিযোগ কি সত্য ?

যদি মনে করি শেষের দিকে সত্যজিৎ রায় এবং সুব্রত মিত্রের সম্পর্ক বার্গম্যান এবং গুণার ফিশারের মতো হয়েছিল সেটা কি অলীক কল্পনা ?

বার্গম্যানের আপন ভাষ্য—''ধীরে ধীরে আমার আর গুণার ফিশারের ভাবনা চিন্তার যোগটা ছিঁড়ে গেল । আমাদের দুজনের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেল । মানে আমাদের দুজনের একত্ব আমাদের দুজনের ব্যক্তি(গত সম্পর্ক, ব্যক্তি(গত আন্তরিক আদান-প্রদান যা আমাদের কাজে ছিল তা অত্যন্ত দরকারি, সেটা আলগা হয়ে গেল, পুরোনো বাঁধনটা খসে গেল। এর কারণ কি জানেন, দিন দিন আমি ওর উপর বড্ড বেশি কর্তৃত্ব করছিলাম, প্রায় পীড়নকারী হয়ে উঠেছিলাম। নিষ্ঠুর ও খামখেয়ালী হয়ে উঠেছিলাম এবং এ-ব্যাপারটায়ও সচেতন হয়ে উঠেছিলাম যে আমি ওঁকে অপমান করতে পারি। অথচ গুণার ফিসার কিন্তু একজন অসাধারণ শিল্পী । নীরব অন্তর্মুখী একজন মিউজিশিয়ানের মতো । আমি ওঁর প্রতি যত আত্র(মণাত্মক হয়ে উঠেছি, তিনি তত নিজেকে নিজের ভেতর গুটিয়ে নিচ্ছেন । অদ্ভুত মানুষ । 'ডেভিলস আই'-তে ব্যাপারটা আমাদের প্রায় ভাঙনের মুখে নিয়ে এল । কাজ যদি কিছু হয়ে থাকে, সেটা হয়েছে,—যেহেতু তিনি একজন শিল্পী, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার কাজের ব্যাপারে আমি কখনো প্রস্তুত থাকতে পারিনি ।''

সত্যজিৎ রায় সম্বন্ধে শর্মিলা ঠাকুর লিখেছেন—''...আবার অন্যদিকে তিনি কিন্তু বিরাট রগচটা । সুব্রতদা বা ইউনিটের অন্যদের সঙ্গে রেগেমেগে কথা বলতেন । সেখানে তাঁর ইগোর ব্যাপার । মানিকদা সবসময় অন্যদের কন্ট্রোল করতে চেয়েছেন । তাঁকে ঘিরেই অন্যরা পরিচিত হোক সব সময় সেটাই চেয়েছেন । বংশীদার অবশ্য একটা আলাদা আইডেনটিটি ছিল । সুব্রতও শেষ পর্যন্ত চলে যায় । অনেকের মতো ওঁর ইগোও এইরকম ছিল—আমার সঙ্গে কাজ করতে গেলে শুধু আমার সঙ্গেই থাকতে হবে । দেবীর আউটডোর দৃশ্যগুলো হয়েছিল নিমতিতায় । ভোরবেলায় পাঁচটা থেকে সাতটার মধ্যে আউটডোর সেরে ফেলতে হত । তখনই দেখতাম সুব্রতর সঙ্গে মানিকদার অল্প অল্প খিটিমিটি আরম্ভ হয়ে গেছে । সুব্রত বোধহয় একটু বেশী সময় নিচ্ছে ।...

মানিকদার অদ্ভুত কথাগুলো ছেলেমানুষি ছিল, অনেক পরে, নায়ক না কী একটা ছবি করতে এসে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'সুব্রত কোথায় ?' উনি বললেন, সুব্রত কাজ করছে না, ও মোটা হয়ে গেছে ।' এটাই মানিকদার ছেলেমানুষি । বললেই পারতেন ও ব্যস্ত, ও পারছে না । কিন্তু বললেন, ও মোটা হয়ে গেছে ।' মানিকদার মুখে এটা কেমন যেন বেমানান লেগেছিল। 'পূর্ণেন্দু বোস, যিনি সত্যজিৎ রায়ের একটা ছবির আংশিক সিনেমাটোগ্রাফার এবং অনেকগুলো ছবির সহকারী সিনেমাটোগ্রাফার। আমাকে বলেছিলেন, শেষের দিকে মানিকদা অন্যরকম হয়ে গিয়েছিলেন । নিজেকে আলাদা করে ভাবতেন । আলাদা থাকতেন, আলাদা খেতেন । ফিল্ম ইউনিট—এক পরিবারের সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল । আমরা একরকম করেছি, কিন্তু সুব্রতবাবু করলে আলাদা একটা 'দর্শন' হতো । বিদেশে মানিকদার ছবির যতটা আলোচনা, প্রশংসা হয়েছে, ঠিক ততটা, বোধহয় একটু বেশিই আলোচনা, প্রশংসা হয়েছে সুব্রতবাবুর সিনেমাটোগ্রাফি সম্বন্ধে । এটা মানিকদা সহ্য করতে পারতেন না। সেটে সুব্রতবাবুর কাজে নাকগলাতে শু(করেছিলেন । এটা মাত্রা ছাড়িয়ে যেত, যখন সেটে বিশেষ কেউ বা বিদেশিরা আসতেন । একবার তো সুব্রতবাবু গলা থেকে মিটার (আলো পরিমাপক) খুলে বলেছিলেন—যান, আপনি গিয়ে আলো মেপে আসুন ।

'...মোমা অর্থাৎ নিউ ইয়র্কের মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট-এ পথের পাঁচালীর আন্তর্জাতিক উদ্বোধনের পর তিন সপ্তাহ কেটে গেল । কিন্তু ছবি যে ওদের কেমন লেগেছে, তার কোন খবরই ইতিমধ্যে এসে পৌঁছোল না । ...একেবারে হঠাৎই এই সময় হুইলারের কাছ থেকে একটা তারবার্তা পৌঁছাল । ''আ ট্রায়ম্ফ অফ ইমাজিনেটিভ ফোটোগ্রাফি ।'' তারবার্তাটা সুব্রত

মিত্রের হাতে তুলে দিয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিলাম ।' এই ঘটনা আমরা জানতে পারলাম সত্যজিৎ রায় মারা যাবার পর তাঁর 'অপুর পাঁচালী'র বই থেকে ।

আর একটা বিষয় বিশেষ ভাবে ল(ণীয়, সত্যজিৎ রায় অনেক (ে ত্রে 'ক্যামেরা শৈলী সম্বন্ধে স্ব-বিরোধী কথা বলেছেন। 'ক্যামেরা শৈলী' রচনায় লিখেছেন 'চা(লতা' ছবির পর থেকে ক্যামেরা চালনা করছেন । আবার 'জেমস ব্লু'কে বলেছেন 'মহানগর' থেকে ক্যামেরা চালনা করছেন । কেন তিনি ক্যামেরা চালনা করেছেন, এই বিষয়েও তাঁর মতামত স্ব-বিরোধী । নিজের ক্যামেরা চালনা সম্বন্ধে 'ক্যামেরা শৈলী' রচনায় যা লিখেছেন, ঠিক তার বিপরীত কথা বলেছেন জেমস ব্লুকে । ত্র(মেই যেন সত্যজিৎ রায় তাঁর সিনেমাটোগ্রাফারদের অবি(্বাস, অশ্রদ্ধা করতে শু(করেছিলেন,—সেই যে বাষট্টি-তেষট্টি সালে মহানগর তুলেছিলাম, সেই থেকে ক্যামেরা ধরেছি । সমস্ত শট যাবতীয় যা কিছু । আরিফ্লেক্স-এ চোখ রেখে নির্দেশ দিতে চমৎকার লাগে। ওই-ই এক মাত্র জায়গা যেখান থেকে বলা যায় কোন অভিনেতা কোনখানে ঠিক কতোটা তফাতে রয়েছে । বসে কিংবা দাঁড়িয়ে পরিচালকের কাজে জুৎ হয় না ।...অবশ্য ক্যামেরাম্যান অনবরতই বলবেন, আর একটা টেক নেওয়া যাক । আমি সাধারণত জিজ্ঞেস করি, কেন ? কেন বলতে হবে ? ও কখনোই নির্দিষ্ট করে বলে না কেন । ও নিজে নিশ্চিত নয় । আমি কিন্তু নিশ্চিত, কখন কলাকৌশলের কারবার জ(রী হয়ে ওঠা দরকার তা কেবল পরিচালকের প(ই জানা সম্ভব । আবার কিছু শট এমন হলো, যে টেকনিক বড় কথা নয় অন্য কিছুর সেখানে আসল প্রাধান্য । কাজেই এমন কি, যদি প্যানিং একটু এদিক-ওদিক সরেও যায় তাতে যায় আসে না । তাছাড়া অত্যন্ত সীমিত পরিমাণ কাঁচামাল নিয়ে যেখানে কাজ করা সেখানে রি-টেক-এর প্র(ও সমস্যা । প্রধানত এই কারণেই আমি নিজে ক্যামেরা ধরা শু(করেছি ।'

'অপুর পাঁচালী'তে সত্যজিৎ রায় 'বাউন্স লাইট' সম্বন্ধে লিখেছেন—এর (অপরাজিত ১৯৫৬) বছর দশেক বাদে বার্গম্যানের ক্যামেরাম্যান স্কেন নিকুইস্ট এই একই পদ্ধতিতে কাজ করেন ।

'অ্যামেরিকান সিনেমাটোগ্রাফার' পত্রিকায় স্বেন দাবি করেন যে, তিনিই এই পদ্ধতির উদ্ভাবক । জেমস ব্লুকে সা(াৎকারে সত্যজিৎ রায় কিন্তু অন্য কথা বলেছেন । স্বেন নিকভিস্টের রচনাটি ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে আমেরিকান সিনেমাটোগ্রাফার পত্রিকায় 'ফোটোগ্রাফিং দি ফিল্মস অফ ইঙ্গমার বার্গম্যান' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল । তাতে কিন্তু স্বেন নিকভিস্ট কোথাও দাবি করেননি যে তিনি 'বাউন্স লাইটিং' পদ্ধতির উদ্ভাবক । এই প্রসঙ্গে মৃণাল সেন-এর সঙ্গে এক সা(াৎকারে সুব্রত মিত্র বলেছেন—'অ্যামেরিকান সিনেমাটোগ্রাফার পত্রিকায় বার্গম্যানের ক্যামেরাম্যান স্বেন নিকভিস্ট-এর একটা প্রবন্ধ পড়ে আমি খুবই উত্তেজিত এবং আনন্দিত হয়েছিলাম । নিকভিস্ট লিখেছেন—আমি চল্লিশটা কাহিনীচিত্রের ক্যামেরাম্যান । আজ যখন আমার চল্লিশটা কাহিনীচিত্রের আলোকায়ন কৌশলের পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করি, আমি এই ভেবে কখনো কখনো আতঙ্কিত হই যে আমার আলোকায়নে মাঝে মাঝে দৃষ্টিকটু রকমের উজ্জ্বল আলোর ছাপ এবং সেটের দেওয়ালে ঝকঝকে দুটো ছায়া রয়ে গেছে । ১৯৬১ সালে 'দি কমুনিকেন্ট' ছবি করার সময় নিকভিস্ট এবং বার্গম্যান ডেলকারলিয়ান চার্চের ভিতরই আলোর প্রকৃতির ব্যাপক পর্যবে(ণ করেছিলেন । এই পর্যবে(ণের ফলেই নিকভিস্ট সরাসরি ছায়াহীন আলোর উৎসের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন । এবং পরবর্তীকালে স্টুডিও-র মধ্যে এই ছবির চার্চের ভিতরের দৃশ্যগুলির আলোকচিত্রায়ণের জন্য নিকভিস্ট ব্যাপকভাবে 'বাউন্স লাইট' ব্যবহার করেছিলেন ।'

ইতিহাসের, সময়ের দাবিতে প্রকৃতির আকর্ষণে মানুষ একত্রিত হয় । আবার এই একই কারণেই বিচ্ছিন্নও হয় । এর জন্য কে কতটা দায়ী, কে কত বড়-ছোট—এই বিচার কে করবে ? প্রকৃতি তার নিজের নিয়মেই চলে । সত্যজিৎ রায় বংশীচন্দ্র গুপ্ত এবং সুব্রত মিত্রের মণিকাঞ্চন যোগে যে অপূর্ব শিল্প-সৃষ্টি হয়েছিল, যে অবিস্মরণীয় শিল্পরস বি(্বাসী উপভোগ করেছে, করছে—এই ভেবে মাঝে মাঝে বেদনার্ত হই যে, সত্যজিৎ রায় আর সুব্রত মিত্র একসঙ্গে আরও কাজ না করাতে আমরা কতটা বঞ্চিত হয়েছি। চলচ্চিত্র শিল্পের যে অপূরণীয় (তি হলো তা পূরণের জন্য কতদিন অপে(া করতে হবে কেউ জানে না। আন্তর্জাতিক আঙিনায় ভারতীয় চলচ্চিত্রের যে উত্তরণ, যে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা ছিল তা হলো না । অথচ সত্যজিৎ রায় এবং সুব্রত মিত্র দুজনেই নিজ নিজ (ে ত্রে সিনেমা শিল্পের সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। বি(্বাসীর প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন ।

।। আমি একটাই কাজ পারি—সিনেমাটোগ্রাফি ।।

পথের পাঁচালীর জন্মলগ্নে স্টুডিও মহলের অনেকেরই ধারণা ছিল—'অত কম আলোতে ফিল্ম এক্সপোজই হবে না ।' আজ কিন্তু অনেকেরই ধারণা—সুব্রত মিত্রকে না পেলে সত্যজিৎ রায়ের প('পথের পাঁচালী' সৃষ্টি করা সম্ভব হতো না । একদা আলাপচারিতায় ত(ণ আলোকচিত্রী কমল নায়েক (যিনি বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত পরিচালিত 'নিম অন্নপূর্ণা' ছবি চিত্রায়ণের জন্য সেরা আলোকচিত্রীর জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন ।) আমাকে বলেছেন—'আমরা ক্যামেরাম্যান আর উনি (সুব্রত মিত্র) হলেন শিল্পী, প্রকৃত আর্টিস্ট ।'

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সম্প্রতি একটি সা(াৎকারে আলোকচিত্রী কে. কে. মহাজন, যিনি শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রী হিসাবে চারবার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন) বলেছেন, —'যদি প্রকৃত ক্যামেরার কাজ দেখতে চান, সুব্রত মিত্রের ক্যালিভার দেখতে চান, তাহলে ভিক্টর ব্যানার্জী পরিচালিত 'অ্যান আগস্ট রিকোয়েম' দেখুন।'

১৯৪৯ সাল ।

Gregg Toland, Joseph Ruttenberg, Robert Krasker, Guy Green-এর তোলা বিভিন্ন ছবি দেখে St. Xavier's College-এর 2nd year-এর I.Sc. পড়ুয়া এক ত(ণ ঠিক করলো ভবিষ্যতে সে সিনেমাটোগ্রাফার হবে । কিন্তু তার এই সিদ্ধান্তে আত্মীয়-স্বজনসহ বন্ধু-বান্ধবরা কেউই খুশি হলো না । তবে, বাবা-মা তার সহায় । ওরা ছেলের কোন কাজে কোনদিন বাধা দেননি । তখন সিনেমাটোগ্রাফি শেখার কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না । তাই সে তৎকালীন কয়েকজন নামকরা ক্যামেরাম্যানের কাছে গেল সহকারী হিসাবে কাজ করার আশা নিয়ে । কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, কেউ তার আশা পূরণ করল না । সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল না ।

১৯৫০ সাল । জানুয়ারী মাস ।

জগৎবিখ্যাত ফরাসী চলচ্চিত্র-পরিচালক Jean Renior তাঁর 'The River' ছবির সুটিং করতে এলেন কলকাতায় । ছেলেটার বাবা তাকে এই ছবির আমেরিকান প্রযোজক Mcelpo-র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল । এই ছবির ক্যামেরাম্যান ছিলেন Renoir-র ভাইপো Claude Renior । অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে ছেলেটা Observer হিসাবে সুটিং দেখার অনুমতি পেল । ছেলেটা সুটিং দেখতো আর তার খাতায় যাবতীয় বিষয় লিখে রাখতো । এইসময় ছেলেটার সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের আলাপ হয় । সত্যজিৎ রায় ছেলেটার মুখে ছবির সুটিং-এর গল্প শুনতেন আর তার তোলা ছবি দেখতেন এবং ছেলেটাকে বলতেন—'তোমার কিন্তু চোখ তৈরী হয়ে গেছে ।' ছেলেটার নোট খাতা দেখে ছবির পরিচালক Renoir খুশি হয়ে ক্যামেরাম্যান Claude Renoir-কে দেখান । খাতাটা দেখে Claude তো অবাক ! আরও অবাক হবার কথা, বেশ কিছুদিন পর একটা শট 'রি-টেক' করার সময় Claude ছেলেটার খাতা দেখেই লাইটিং ঠিক করেছিলেন !

১৯৫২ সাল ।

'পথের পাঁচালী' করার সময় সত্যজিৎ রায় প্রথমে ছেলেটাকে বলেছিলেন—'এ ছবি হলে নিমাই ঘোষ ক্যামেরাম্যান হবেন এবং তোমাকে এটুকু কথা দিতে পারি যে, তুমি থার্ড কিংবা ফোর্থ অ্যাসিসটেন্ট হিসাবে কাজ পাবে ।'

কথাই তো আছে—'লেগে থাকলে সুযোগ আসবে ।' তাই পথের পাঁচালী'র আলোকচিত্রী হিসাবেই ছেলেটা আত্মপ্রকাশ

করলো। আজকের দুনিয়ার একজন অন্যতম সেরা সিনেমাটোগ্রাফার সুব্রত মিত্র। সিনেমাটোগ্রাফির জগতে সৃষ্টি হলো সুব্রত মিত্রের নিজস্ব ঘরাণা। ছবি করার জন্য নিজেকে কীভাবে তৈরী করেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে সুব্রতবাবু জানালেন—'প্রথমে আমি ছবির চিত্রনাট্য শুনি এবং পরিচালকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করি। তারপর লোকেশনে গিয়ে স্থিরচিত্র তুলি এবং তার ফলাফল অনুযায়ী কীভাবে আলো করতে হবে ছবির জন্য তা স্থির করি।

আলোকচিত্রী পরিচালকের আজ্ঞাবহ নন। সৃজনশীল আলোকচিত্রী নানাভাবে পরিচালককে সাহায্য করে। পরিচালক 'এ'-র সঙ্গে আলোকচিত্রী 'এ'-র একরকম সম্পর্ক এবং পরিচালক 'বি'-র সঙ্গে আলোকচিত্রী 'এ'-র আর একরকম সম্পর্ক।'—পরিচালক ও আলোকচিত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধে এটা তাঁর অভিমত।

চলচ্চিত্রের ভাষা ও কম্পোজিশন, আলো সম্বন্ধে সুব্রতবাবুর ধারণা—'একজন আলোকচিত্রীকে কম্পোজিশনের সব নিয়মগুলি জানতে হবে এবং ছবি করার সময় সব নিয়মগুলি আবার ভুলে যাওয়া উচিত। কারণ, ছবির থীম থেকেই ছবির কম্পোজিশন সৃষ্টি হয়। এবং এই কারণে ছবির ভাষা ও কম্পোজিশন অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। ছবির থীম থেকেই কীভাবে আলো ব্যবহার করা হবে ঠিক করা হয়। অনেক সময় পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা করি। যেমন 'অপরাজিত' ছবিতে বাউন্স লাইট ব্যবহার করেছি। 'চা(লতা'র জন্য তৈরী করেছিলাম কাঠের বাক্স দিয়ে বিশেষ এক ধরনের আলো। এই ধরনের লাইট নাকি এখন বিদেশী কোম্পানীগুলি তৈরী করছে।'

এক্সপোজার এবং ফিল্ম সম্বন্ধে তিনি বললেন—ন্যূনতম সঠিক এক্সপোজার বলে কিছু নেই। বাঞ্ছিত ফল পাওয়ার জন্য যে এক্সপোজার ব্যবহার করছি তাকে আমি ক্রি(য়েটিভ এক্সপোজার বলবো। সংগীতের সঙ্গে আলোকচিত্র এবং চলচ্চিত্রের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সংগীতের স্বরবিন্যাসের মত আলোর স্তরবিন্যাস করা উচিত। তাহলে কাজ করতে সুবিধা হয়। এবং সহজে আলোর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়। এই বিষয়ে পুনাতে একটা সেমিনারে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সাদা-কালো এবং রঙিন দু'ধরনের ফিল্মেই কাজ করা সহজ আবার কঠিন। রঙিন ফিল্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ডাইমেনশন সৃষ্টি হয়। সাদাকালো ফিল্মের ে(ত্রে আলো নিয়ন্ত্রণ করে ডাইমেনশন সৃষ্টি করতে হয়। আমাদের দেশে যে ফিল্ম পাওয়া যায় তার মান সব সময় ঠিক থাকে না। কাজ করতে গিয়ে বেশ কয়েকবার দেখেছি ফিল্মের মান ঠিক নেই। তাই আমি প্রথমে ফিল্ম টেস্ট করে নি। ভারতে আলোকচিত্রের সবরকম আধুনিক যন্ত্র পাওয়া যায়। কিন্তু তার সঠিক র(ণাবে(ণ হয় না। এর ফলে যন্ত্রগুলি খুব তাড়াতাড়ি কাজের অনুপযুক্ত(হয়ে যায়।

সুব্রতবাবু মনে করেন—শিল্প নির্দেশক, আলোকচিত্রী, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্পর্কটা বন্ধুত্বের এবং সহযোগিতার। কারণ, চলচ্চিত্র একটা যৌথ শিল্পমাধ্যম। তাই নিটোল দলগত সংহতি ছাড়া একটা সার্থক ছবি তৈরী হতে পারে না এবং কোন কর্মীর কাছ থেকেই চূড়ান্ত ফল আশা করা যায় না। অনেক পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছি। সবার সঙ্গেই কাজ করে আনন্দ পাই। তবে কেউ কেউ আলোকচিত্র সম্বন্ধে একটু বেশী বোঝে। অতটা বেশী বোঝা উচিত না। বুঝতেই পারছেন আমি মানিকদার কথা বলছি। মানিকদা বোঝে, নো ডাউট বোঝে। তবে একটু বেশী বোঝে। অতটা বেশী বোঝা ওঁর উচিত না। শেষের দিকে আমার কাজে খুব বেশী ইন্টারফেয়ার করতেন, তাই আর কাজ করলাম না। ছেড়ে দিলাম।

''নেহে(ছবিতে কাজ করতে কোন অসুবিধা হয়নি। রাশিয়ান যে ক্যামেরাম্যান ছিল, সে খুব ভাল ছেলে। আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক খুব ভাল ছিল। ও এক অ(র ইংরাজী জানে না, আমিও এক অ(র রাশিয়ান জানি না (দেখা হলেই ও আমাকে জড়িয়ে ধরে পকেট থেকে সিগারেট নিয়ে খেতো। মূলত ও আউটডোরের কাজগুলি করেছে, আর আমি ইনডোরের কাজগুলি করেছি। ফিল্ম ডিভিসনের কথা আর বলবেন না। ওদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি আর কোনদিন ওদের কাজ করবো না। কতকগুলি অপদার্থ, অশি(ত লোকের আড্ডা ওটা। আমার কাজ বোঝার কোন (মতা ওদের নেই।

আমাদের দেশে চলচ্চিত্র-সমালোচকরা আলোকচিত্রায়ণ ব্যাপারটা বোঝেন না। বোঝার মতো টেকনিক্যাল জ্ঞান ওদের নেই। ফিল্ম সোসাইটি, ফিল্ম আর্কাইভ, সিনে ক্লাব সম্বন্ধে কী আর বলবো। এই দেখুন না, সেদিন সরকার শিশির

মঞ্চে একটা ছবি দেখাচ্ছিল । দেখলাম ছবিটার মাঝখানে ফোকাস হচ্ছে, তার দু'দিকে আউট অফ ফোকাস। খুব খারাপ লাগলো । অপারেটর (মে গিয়ে বললাম, —এই ছবিটার আমি ক্যামেরা ম্যান । ফিল্মটা টিল্ট হয়ে আছে, একটু ঠিক করে চালান, আউট অফ ফোকাস হবে না । কিন্তু কে শোনে কার কথা । সিটে এসে দেখি আগে যা ছিল সে রকমই চলছে । কেউ কিছু বলছে না। আজ থেকে ৩০-৪০ বছর পর আমার ছবিগুলিকে আমি আর আমার কাজ বলে স্বীকার করবো না । খুব বাজে, অবৈজ্ঞানিকভাবে ছবিগুলি রাখা হচ্ছে আর্কাইভে । সেমিনারে পুনার ছেলেদের বলেছিলাম, —তোমরা 'দেবী' দেখো, ওখানে 'টোনালী'টা খুব ভালো আছে । ওরা 'দেবী' দেখে খুব খারাপ কথা বললো । কারো কোন চেষ্টা নেই । আন্তরিকতা নেই । এই তো অবস্থা ।

আমি একবার জুরী হয়েছিলাম । অবাক কাণ্ড । দেখলাম একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক পুরস্কার পাবে দশ হাজার টাকা, আর শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রী পাবে পাঁচ হাজার টাকা । আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলাম । একজন গায়ক ছাড়া ছবি হয় । কিন্তু আলোকচিত্রী ছাড়া কি ছবি তৈরী করা যায় ? সেই থেকে শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রীকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয় ।''

পুনার শি(াপদ্ধতি সম্বন্ধে সুব্রতবাবুর ধারণা খুব ভাল । '—পুনার ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সঙ্গে আমি গভীরভাবে যুক্ত(। 'Academic Council'-এর মিটিং-এ বছরে অন্তত দুবার যেতেই হয় । এছাড়া সিনেমাটোগ্রাফির ছাত্রদের লেকচার দিতে হয়, ওয়ার্কশপ করতে প্রায়ই যাই। ভবিষ্যতের সিনেমাটোগ্রাফারদের সঙ্গে সময় কাটাতে এবং তাদের প্রস্তুত করে দিতে আমার খুব ভাল লাগে । খুব অবাক হবার কথা, এখন একজন প্রথম বছরের ছাত্র যা জানে, আমি 'পথের পাঁচালী' তোলার সময় তার অনেক কিছুই জানতাম না ।'

নিজের সম্বন্ধে সুব্রতবাবুর ধারণা—'আমি ভাই একটাই কাজ পারি । অনেকে অনেক কাজ করতে পারে । আমি একটাই করি । তাও সময় লাগে । চিন্তাভাবনা না করে কাজ করি না । একবার ঠিক হলো মৃণালবাবুর ছবিতে কাজ করবো। কিন্তু মৃণালবাবু বললেন উনি বার্লিন না কোথায় যাবেন, ফিরে এলেই ছবি শু(করবেন । আমি ওভাবে কাজ করতে পারি না । তাই আর হলো না । আমার কাজের জন্য সময় দরকার । আমি একটাই কাজ পারি—সিনেমাটোগ্রাফি ।'

আমরা আনন্দিত । আমরা গর্বিত । আমরা সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি সুব্রতবাবুকে তাঁর পদ্মশ্রী সম্মান, —'দি নিউ দিল্লী টাইমস্' ছবিতে আলোকচিত্রায়ণের জন্য শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রীর জাতীয় পুরস্কার এবং 'হাওয়াই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব' কর্তৃক প্রদত্ত 'ইস্টম্যান কোডাক পুরস্কার'—'৯২ প্রাপ্তির জন্য ।

'For all practical purposes, *Pather Panchali* (Song of the Road, 1955) was our diploma film. Most of the shots taken on the very first day of shooting—the train scene, the *kaash* fields—had to be dropped, for they showed the children's walk at too slow a pace. But my work on the whole was quite satisfactory, and the scene looked beautiful. I recall the evening at the lab when we all waited to see the rushes of the first day's work. There was a rumour circulating already that we had made a real blunder and that nothing would be seen on the screen. I remember clearly how I felt through that short span of time between when the lights went off in the preview theatre and the first image flashed across the screen. I could have died in that darkness.

The fact that we were new to the field gave us the strength of mind to go against several well established codes and conventions.'

'On Shooting the Apu Trilogy'
Subrata Mitra